গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৮ সংখ্যা ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

উর্দু ঃ বিজেপি নেতার বিবৃতি নিন্দনীয়

এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১৫ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছেন—

"ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা উর্দুকে "সন্ত্রাসবাদীদের ভাষা" বলে অভিহিত করে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতা বিনয় কাটিয়ার যে বিবৃতি দিয়েছেন, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি।

মনে রাখা দরকার যে, অন্যান্য উন্নত ভারতীয় ভাষার মতো উর্দু ভাষাও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বহু জাতীয়তাবাদী নেতা ও বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা শক্তিশালী মাধ্যম রূপে উর্দুভাষাকে ব্যবহার করেছেন।

বিজেপি ও কংগ্রেস উভয়েরই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই এই ভাষাটি দীর্ঘকাল ধরে সুপরিকল্পিতভাবে অবহেলিত হয়ে আসছে এবং তাকে পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে উত্তরপ্রদেশের সরকারি কাজে তার ব্যবহার বন্ধ করার যে দাবি তোলা হয়েছে, তা উর্দু ভাষার উপর আবার একটি নগ্ন আক্রমণ। ভাষাগত সংঘর্ষ ও সম্প্রদায়িক উত্তেজনা উস্কে দিয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের চাঙ্গা করে নির্বাচনে তাকে কাজে লাগানোর হীন মতলবেই এটা করা হচ্ছে।

আরাফতকে নির্বাসিত করার ইজরায়েলি হুমকির প্রতিবাদে ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের বিক্ষোভ। বক্তব্য রাখছেন পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক।

'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' ও সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা

গত ১২ সেপ্টেম্বর সি পি এমের মুখপত্র 'গণশক্তি' পত্রিকায় 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ কার স্বার্থে?' — এই শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নিবন্ধের মূল কথা — কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে মালিক তোষণকারী নীতি নিয়ে চলছে এবং রাজ্য সরকার এক নাগাড়ে তা প্রতিরোধ করার জন্য বিকল্প নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। তথ্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিবন্ধকার সি পি এম নেতা সুজয় চক্রবর্তী এমন সব দাবি দুঃসাহসের সাথে করেছেন যার সাথে সত্যের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। যেমন তিনি বলেছেন, — "অন্য রাজ্যগুলো যখন বিদ্যুতায়নে তাদের দায় অস্বীকার করতে চাইছে, বেসরকারীকরণের উপর নির্ভর করতে চাইছে, এ রাজ্যের সরকার তখন পূর্ণ দায়িত্বশীল।" বা "বেসরকারীকরণের নামে মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশের মতো বিদ্যুতের দাম দ্রুতগতিতে বাড়িয়ে তোলা মানে গ্রামীণ জনগণকে বিদ্যুতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এ রাজ্যে তা হতে পারে না।" এই ধরনের ভিত্তিহীন দাবিতে নিবন্ধ ভর্তি। মিথ্যাকে সরবে বার বার বলে তাকে সত্য বলে মানুষকে বিশ্বাস করিয়ে নেওয়ার তথাকথিত গোয়েবলসীয় রীতিতে যে সি পি এম দক্ষ, একথা আমাদের অজানা নয়। যে গ্রামীণ জনগণের জন্য সি পি এম নেতাদের কুম্ভীরাশ্রু বর্ষিত হচ্ছে, তাদের রাজত্বে রাজ্যের সেই গ্রামীণ কৃষক সম্প্রদায়কেই ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাম দিয়ে বিদ্যুৎ কিনতে হয়। বিদ্যুৎমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত এ সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আর গৃহস্থদের বিদ্যুতের দাম ১০০ ইউনিট প্রতি গুজরাটে যেখানে ৭৩ টাকা, এ রাজ্যে তা ৩০০

ছয়ের পাতায় দেখুন

আদবানিকে রেহাই দিল সি বি আই

বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয় ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর। অত্যন্ত পরিকল্পনা করে এবং বিজেপি, ভি এইচ পি নেতাদের উপস্থিতি ও প্রকাশ্য মদতেই যে সংখ্যালঘুদের এই ধর্মস্থানটিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা গোপন ছিল না। এই ধ্বংসের পরিণামে সারা দেশে কত শত নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছিল, তার সঠিক হিসাব নেই।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় ভিডিও-য় তোলা ছবিতে এল কে আদবানি সহ বিজেপি'র অন্যান্য নেতাদের মদতদাতার ভূমিকাটি নগ্ন হয়ে ধরা পড়েছিল। ফলে এদের বিরুদ্ধে তদন্তের আদেশ দিয়ে অভিযোগ দায়ের না করে সরকারের উপায় ছিলনা।

কেন্দ্রীয় তদন্তব্যুরো ১৯৯৭ সালে লক্ষ্ণৌয়ের অতিরিক্ত দায়রা আদালতে চার্জশিট পেশ করেছিল। তাতে বলা হয়েছিল — '১৯৯০ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে ১নং থেকে ৩০নং অভিযুক্তরা অযোধ্যা, বেনারস ও মথুরার মন্দিরকে পুরোপুরি মুক্ত করার নামে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তারা ঠিক করেছিল বাবরি মসজিদ মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হবে, কাঠামোর প্রধান গলিতে মিরবাগির পাথরখণ্ডটি অপসারিত করা হবে। এবং এটা করা হবে সকলে মিলে পরিকল্পিতভাবে। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় অভিযুক্তদের কয়েকজন বিতর্কিত কাঠামোটি ভেঙে দেয়। তারা জানত যে তাদের এই কাজে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হতে পারে যা দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। তারা একথাও জানত যে, হিন্দু ও মুসলিমদের ধর্মীয় ভাবাবেগের সংঘাত থেকে তা সমগ্র বিশ্বে ও দেশের মধ্যে মানুষের জীবন ও সম্পত্তির হানি ঘটাবে।'

সি বি আই-এর পেশ করা ৩০ জন অভিযুক্তের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিল এল কে আদবানির নাম। যাদের নামে এবার সি বি আই তাদের অভিযোগ দায়ের করেছে, তাদের প্রায়

আটের পাতায় দেখুন

বন্যা ঃ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অপরাধমূলক অবহেলাই দায়ী

সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ

রাজ্যের গুরুতর বন্যাপরিস্থিতি নিয়ে এস ইউ সি আই রাজ্য দপ্তরে ১৮ সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন—

"এবার মালদহ ও মুর্শিদাবাদে ভয়াবহ বন্যা ও মানুষের চরম দুর্গতির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অপরাধজনক অবহেলাই দায়ী। '৯৮ ও ২০০০ সালে ভয়াবহ বন্যার সময় মন্ত্রীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নদী সংস্কার করবেন, বন্যাপ্রবণ এলাকায় ফ্লাড সেন্টার গড়বেন, দ্রুত উদ্ধারের জন্য নৌকা, স্পীড বোট ইত্যাদির ব্যবস্থা ও উপযুক্ত ত্রাণ সামগ্রীর আয়োজন করবেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা কিছুই করেন নি। ফলে এবার ইতিমধ্যেই প্রায় ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষ বিপন্ন।

মালদায় একটানা ভাঙনে ১০,০০০ হেক্টর জমি ও ২৮টি মৌজা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদের ফাজিলপুরে গঙ্গা ও পদ্মার মধ্যে দূরত্ব কমতে কমতে ০.৮ কিলোমিটারে পৌঁছেছে, ফলে যে কোন সময় ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটতে পারে। বস্তুত দুই জেলার অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পারস্পরিক দোষারোপ করছে, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ত্রাণ ও পুনর্বাসন বলতে সরকারি বিবৃতি ছাড়া বিপন্ন মানুষ কিছুই পাচ্ছে না।

প্রতিবারের মতো এবারও সরকারি অবহেলার মর্মান্তিক পরিণতি দেখা যেতেই মুখ্যমন্ত্রী 'মাস্টার প্ল্যান'-এর ধূয়া তুলে বলেছেন, কেন্দ্র এ ব্যাপারে কিছু করছে না। তিনি নিজে এখন কেন্দ্রের কাছে দরবার করবেন বলে জানিয়েছেন। আমাদের প্রশ্ন — ১৯৯৮ ও ২০০০ সালের বন্যার পর বহুদিন পার হয়েছে, এতকাল রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়নি কেন? এবার রাজ্য সরকার বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রের কাছে ৯০০

আটের পাতায় দেখুন

পানীয় জল দূষণমুক্ত করতে হবে

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"হাইকোর্টের নির্দেশে জনস্বাস্থ্য দপ্তর ২১টি প্রতিষ্ঠানে পানীয় জল পরীক্ষা করে মারাত্মক বীজানু পেয়ে পানের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। আমরা আশঙ্কা করি, শুধু ২১টি প্রতিষ্ঠানই নয় — কলকাতা শহরের সর্বত্র ও রাজ্যের অন্যত্র পানীয় জল পরীক্ষা করলে নানা বিপজ্জনক বীজানু পাওয়া যাবে। কারণ সরকার ও মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ জলাধার ও পাইপ লাইন নিয়মিত পরীক্ষা ও মেরামত করে না এবং পানীয় জলও দূষণমুক্ত করে না।

আমরা রাজ্য সরকার, কলকাতা কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি-গুলিকে এই ব্যাপারে যুক্তভাবে উদ্যোগী হবার দাবি জানাচ্ছি।"

ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে লক্ষ্ণৌতে ছাত্রমিছিল

গত ১২ সেপ্টেম্বর অল ইণ্ডিয়া ডি এস ও'র উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যের পূর্বতন মায়াবতী ও বর্তমান মুলায়ম সরকারের ছাত্রস্বার্থবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে লক্ষ্ণৌ শহরে ৭০০-রও বেশি ছাত্রছাত্রী জমায়েত হয়। ছাত্রছাত্রীদের সুসজ্জিত মিছিল লক্ষ্ণৌ জংশন থেকে শহরের বিভিন্ন পথ প্রায় দেড়ঘণ্টা পরিক্রমা করে। বিধানসভার সামনে পুলিশ আটকালে ওখানেই সভা হয় এবং রাজ্যপালের প্রতিনিধির কাছে ছাত্র প্রতিনিধিদল ডেপুটেশন দেয়। গাজিয়াবাদ, বালিয়া, জৌনপুর, প্রতাপগড়, সুলতানপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, মোরাদাবাদ প্রভৃতি জেলা থেকে এবং লক্ষ্ণৌ শহরের এম বি এ, এম সি এ'র শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই মিছিলে অংশগ্রহণ করে। ছাত্রছাত্রীদের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সর্বভারতীয় কাউন্সিল সদস্য এবং রাজ্য যুগ্মসংযোজক কমরেড বলেন্দ্র কাটিয়ার, সভা পরিচালনা করেন কমরেড পূর্ণেন্দু শুক্লা। প্রধান বক্তা সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি কমরেড প্রতাপ শামল বলেন, 'কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পথ অনুসরণ করে রাজ্যের পূর্বতন মায়াবতী এবং বর্তমান মুলায়ম সরকার শিক্ষাকে ব্যবসায়ীদের মুনাফার ক্ষেত্রে পরিণত করছে। শিক্ষা আজ বহুমূল্য পণ্যে পর্যবসিত। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে শিক্ষা কেড়ে নিয়ে দেশের অধিকাংশ মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখার এই চক্রান্ত প্রতিহত করতে হলে ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসতে হবে।' এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় কাউন্সিল সদস্য ও রাজ্য যুগ্মসংযোজক কমরেড পুষ্পেন্দ্র এবং বিভিন্ন জেলার ছাত্র নেতারা।

উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়ায় বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন

বিড়ি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, পি-এফ চালু করা, চিকিৎসার সুব্যবস্থা সহ বিভিন্ন দাবিতে গত ১৩ সেপ্টেম্বর হাবড়া মডেল হাইস্কুলে হাবড়ার বিড়ি শ্রমিকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হাবড়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় দেড়শত বিড়ি শ্রমিক বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সভার প্রধান বক্তা উত্তর ২৪ পরগণা বিড়ি শ্রমিক সমন্বয় সমিতির সম্পাদক কমরেড অশোক দাস তাঁর বক্তব্যে বিড়ি শ্রমিকদের দাবিগুলি নিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে এলাকায় এলাকায় ছড়িয়ে দেবার আহবান জানান। সম্মেলন থেকে স্বপ্না রায়কে সভানেত্রী ও সুকুমার চক্রবর্তীকে সম্পাদক করে "হাবড়া বিড়ি শ্রমিক সমিতি" তৈরি হয়েছে। সম্মেলন শেষে উৎসাহী শ্রমিকরা মিছিল সহকারে হাবড়া শহর পরিক্রমা করেন।

সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানাল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম

সরকারি সংস্থা হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম ও ভারত পেট্রোলিয়ামকে বেসরকারি মালিকানায় তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এই দুই সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, তা রদ করে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে তাকে স্বাগত জানিয়ে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল ১৭ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছেন, বিলগ্নীকরণের ষড়যন্ত্রমূলক প্রয়াসের বিরুদ্ধে এই দুই সংস্থার কর্মচারী ও অফিসাররা যে অদম্য লড়াই করেছেন, সেজন্য তাঁদের অভিনন্দন জানাই। আমরা মনে করি, বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মচারীদের ও সাধারণভাবে দেশের জনগণের মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে।

১৯ সেপ্টেম্বর যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ডাঃ কে পি ঘোষ। মঞ্চে উপস্থিত (বাঁদিক থেকে) স্বাধীনতা সংগ্রামী মনোরঞ্জন ধর, সভার সভাপতি অতুলকৃষ্ণ দে, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অধ্যাপক তরুণ সান্যাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন (ছবিতে নেই) অধ্যাপক কিশোরশঙ্কর রায়, ডাঃ অশোক সামন্ত, ডাঃ অংশুমান মিত্র প্রমুখ

ওন্দায় বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির সম্মেলন

বাঁকুড়া জেলার ওন্দা গ্রুপ সাপ্লাই ভিত্তিক বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দ্বিতীয় বর্ষ সম্মেলন গত ১৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। দেড় শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক প্রতিনিধিসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য অমল মাইতি ভারতীয় বিদ্যুৎ আইনের সর্বনাশা দিকগুলি ব্যাখ্যা করেন। বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ নীতির অন্যান্য জনবিরোধী দিক সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার কোন দায়িত্ব ও ভূমিকা নেই বলে জনগণকে যে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে, তিনি সেটাও ব্যাখ্যা করে দেখান। সভাপতিত্ব করেন বলরাম দাস। প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সুকুমার মুখার্জী (এ্যাডভোকেট), মানিকলাল মুখার্জী (শিক্ষক, ওন্দা হাইস্কুল), জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ (অ্যাবেকা) এবং পাত্রহাটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। গ্রাহকরা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, সমিতি গড়ে তুলতে না পারলে এলাকার বহু মানুষকে অন্ধকারে থাকতে হত, না হলে পর্ষদ কর্তারা হাজার হাজার টাকা ঠকিয়ে নিত।

জয়দেব করকে পুনরায় সম্পাদক ও অমরেন্দ্রনাথ পালিতকে সহ-সম্পাদক এবং মনসারাম সিংকে সভাপতি করে ৩০ জনের কমিটি নির্বাচিত হয়। বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ও কমিশনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে স্থানীয় এস এস অফিসের সামনে ২২ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল নেওয়া বন্ধ করার দাবিতে রূপনারায়ণপুরে ডেপুটেশন

কলকাতা হাইকোর্টের রায় মেনে বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল ইউনিট প্রতি অতিরিক্ত ৫২ পয়সা এবং ফুয়েল সারচার্জ ৯ পয়সা আদায় করা অবিলম্বে বন্ধ করা এবং এপ্রিল মাস থেকে আদায়কৃত অর্থ গ্রাহকদের ফেরৎ দেওয়ার দাবিতে ১৫ সেপ্টেম্বর অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রূপনারায়ণপুর ইলেকট্রিক অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট অফিসার আগামী মাস থেকে অতিরিক্ত মাশুল সহ ফুয়েল সারচার্জ-এর ৬১ পয়সা না নেওয়ার আশ্বাস দেন। ডেপুটেশনের পূর্বে ডাবর মোড়ে গ্রাহকদের এক জমায়েতে অ্যাবেকার সালানপুর ব্লক কমিটির পক্ষে সভাপতি মৃগাঙ্কশেখর দত্ত বলেন, হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায় গ্রাহকদের লাগাতার আন্দোলনেরই জয়। আগামী দিনে বিভিন্ন আন্দোলনে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত গ্রাহকদের সক্রিয় সহযোগিতার আহবান তিনি জানান। এছাড়া কমিটির সম্পাদক বিষ্ণুপদ সাহু বলেন, অ্যাবেকার নেতৃত্বে বিল বয়কট, নিষ্প্রদীপ প্রভৃতি আন্দোলনের ফলেই জনগণ এই সাফল্য পেয়েছেন। এর সমস্ত কৃতিত্ব জনগণের। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ বিল ২০০৩-এর মাধ্যমে পূর্বের সমস্ত বিদ্যুৎ আইন বাতিল করে নূতন আইনের চক্রান্ত করছে। তারা বিদ্যুৎ পরিষেবাকে বেসরকারীকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক লোডশেডিং, ভুয়ো বিল ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের দাবিতে তিনি লাগাতার আন্দোলনের আহবান জানান।

চুক্তিতে শিক্ষক ঃ

শিলিগুড়িতে ছাত্র-যুবকদের প্রতিবাদ

সি পি এম ফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষায় চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করতে চলেছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাত্র ১০০০-২০০০ টাকার বিনিময়ে ৬০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

সারা ভারত ডি এস ও এবং সারা ভারত ডি ওয়াই ও'র পক্ষ থেকে সরকারের এই অগণতান্ত্রিক কালাচুক্তির বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ সংগঠিত করা হচ্ছে। ১৫ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে কোর্টমোড়ে এই দুই সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে 'শিক্ষক নিয়োগের সরকারি কালা সার্কুলার' পোড়ানো হয়। কালা সার্কুলারে অগ্নি-সংযোগ করেন ডি এস ও'র দার্জিলিং জেলা সভাপতি কমরেড উদয় কুণ্ডু।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন ডি এস ও'র দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জয় লোধ, ডি এস ও'র জেলা কমিটির সদস্যা ও মহিলা কলেজের নেত্রী কমরেড মিঠু দে, ডি ওয়াই ও-র জেলা কমিটির সদস্য চন্দন বসাক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে

সিধু-কানুর নেতৃত্বে সংগ্রাম ছিল আসলে শ্রেণীসংগ্রাম

[২০০২ সালে, সাঁওতাল হুল (বিদ্রোহং দিবস উপলক্ষে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী আদিবাসী আন্দোলনগুলি সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন, দলের হিন্দি মুখপত্র 'সর্বহারা দৃষ্টিকোণ'-এর ১৭ বর্ষ ১৮ সংখ্যায় (২৩ সেপ্টেম্বর - ৭ অক্টোবর, ২০০২) তা প্রকাশিত হয়। মূল্যবান এই ভাষণটির বাংলা অনুবাদ আমরা প্রকাশ করছি। অনুবাদের ত্রুটিবিচ্যুতির দায়িত্ব আমাদের — সম্পাদক, গণদাবী।]

হুল-এর (সাঁওতাল বিদ্রোহের) বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভারতের ইতিহাসে তিলকা মাঝি, সিধু, কানু এবং বীরসা মুন্ডার ভূমিকা কী ছিল তা আলোচনার জন্য আমরা আজকের সভায় এসেছি।

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি

কিন্তু আপনারা কী ধরনের আলোচনা চান ? পাঠ্যপুস্তকে যেমন সন, তারিখের বিস্তৃত উল্লেখ করে ইতিহাস লেখা হয়, তা জানতে চাইলে এক কথা। আর বিচারের অন্য পথটা হল সেই সময়ের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির সাধারণ ছবিটাকে জেনে তার ভিত্তিতে সমাজের বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ অংশের মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল তাকে জানা, অর্থাৎ কিনা এই অংশগুলোর নিজেদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ ছিল সে সম্পর্কে সামগ্রিক উপলব্ধির অধিকারী হওয়া। এই দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে আলোচনাই আমাদের ভবিষ্যতের রাস্তা দেখাতে কিছুটা সাহায্য করতে পারে। তাহলে প্রথমেই ঠিক করতে হবে, আমাদের আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভিত্তি কী হবে। আমরা কি পৌরাণিক কাহিনী, লোককাহিনী, গাথাকাব্য ইত্যাদি বংশপরম্পরা ধরে প্রচলিত কাহিনী বা গানগুলিকে ভিত্তি ধরব ? এইগুলোতে সেদিনের সমাজের একটা অস্পষ্ট ছবি অবশ্যই পাওয়া যায়, কিন্তু সত্যিকারের ইতিহাস পাওয়া যায়না। কারণ, বাস্তবের সঙ্গে কবির কল্পনা, নাট্যকারের নিজস্ব চিন্তাভাবনা মিলেমিশে এগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে রসসৃষ্টি। এই রস সাহিত্য থেকে ইতিহাসকে আলাদা করা উচিত। ইতিহাসসম্মত আলোচনা করা মানে হল, যে নিহিত নিয়মের দ্বারা সমাজ পরিচালিত হয় এবং সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ত যে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের উদয় হয়, তাকে লক্ষ্য করা। কাজেই, বলা বাহুল্য, আমাদের আলোচনা হওয়া উচিত ইতিহাসসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং ইতিহাসকে ভিত্তি করে।

মানুষের লিখিত ইতিহাস কমবেশি ৬০০০ বছরের ইতিহাস। আর, অলিখিত ইতিহাস তো লক্ষ লক্ষ বছরের। এখন, এই লিখিত ইতিহাস সমাজের গতিশীলতার এবং পরিবর্তনশীলতার অকাট্য প্রমাণ। এই ইতিহাসে নানান প্রকারের সমাজব্যবস্থা এসেছে এবং চলে গেছে। পরিবর্তনের এই ধারার মধ্যে একটা নিয়ম দেখতে পাওয়া যায় যে, একটা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেটা একটু একটু করে পাল্টাতে থাকে, আর একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছনোর পর গোটা সমাজটাই আমূল পাল্টে যায়। একই সঙ্গে আবার একটা নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তাই, ৬০০০ বছর আগের সমাজ আজ আর নেই। আমরা এখন আর গোষ্ঠীবদ্ধ আদিম সাম্যবাদী সমাজে বাস করছিনা, দাসপ্রভু শাসিত দাসসমাজে বাস করছি না, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শুরুর যুগে বা তার শেষের দিকের যে রাজতান্ত্রিক শাসন তার অধীনেও আমরা আর নেই। আজকের সমাজ এমন একটা সমাজ যেখানে মজুর তার ঘাম ঝরিয়ে উৎপাদন করে, আর সেই উৎপাদনে পুঁজি খাটিয়ে পুঁজিপতি মালিক তার পুঁজি প্রতিমুহূর্তে আরও বাড়িয়ে চলে। এ হল পুঁজিবাদী সমাজ। এই সমাজেই আমরা বাস করি। সেইজন্য, চাই বা না চাই, পরিবর্তনের এই যে নিহিত নিয়ম সে সম্পর্কে চোখ বুজে থেকে ইতিহাস নিয়ে কোনও বিচারবিশ্লেষণ করাই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় যে ঘটনাটা দেখতে পাওয়া যায় তা এই যে, সমাজে আপন গতিতেই পরিবর্তনটা ঘটে যায়, ব্যাপারটা এমন নয়। সমাজের মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব এবং মিলনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন চলতে থাকে, সেই পরিমাণগত পরিবর্তনের মধ্যেও একদিকে সমাজের উদীয়মান শক্তি, আর একদিকে সমাজের মুমূর্ষু শক্তি এই দুয়ের অবিরাম দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। যেমন, সামন্তপ্রভুরা যখন সামন্তী সমাজব্যবস্থাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে আর সাহায্য করতে পারল না, তখন তারা হয়ে পড়ল একমরণোন্মুখ শক্তি। অন্যদিকে ভূমিদাস, বণিক সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী এরা ছিল উদীয়মান শক্তি। সামন্তী শক্তিগুলির সঙ্গে এদের নিরন্তর সংঘর্ষের পরিণতিতেই শেষপর্যন্ত সামন্তী সমাজের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে গেল। ইতিহাসে আমরা এরকমই দেখতে পাই। অর্থাৎ আমরা দেখি এখানে দ্বন্দ্বের নিয়ম কাজ করছে। যখন ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটছে তখন দ্বন্দ্ব চলছেই, কিন্তু গোটা সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটছে না। তবে কিছু পরিবর্তন ঘটছে এবং নতুন উদীয়মান শক্তি ক্রমাগত আরও শক্তিশালী হচ্ছে, আর মুমূর্ষু শক্তি আরও দুর্বল হচ্ছে। এর ফলেই শেষপর্যন্ত উদীয়মান শক্তি পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটাচ্ছে — এটাই আমরা ইতিহাসে দেখেছি। এই দ্বন্দ্ব কারোর চোখ এড়াতে পারে না।

তৃতীয় বিষয় এই যে, এক সমাজ থেকে আর একটি সমাজে বিকাশের প্রক্রিয়াকে বিচারের সাথে সাথে নতুন সমাজের প্রকৃত চরিত্রকেও বিশ্লেষণ করতে হয়। প্রতিটি সমাজব্যবস্থা তার সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপরিকাঠামোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন নিহিত নিয়মের দ্বারা চালিত হয়। যেমন, পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনীতি উচ্চতম মুনাফার নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়। অর্থনীতির এই নিয়মের মধ্যেও দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের রূপকে লক্ষ্য করতে হয়।

মার্কস বলেছিলেন, সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস মানে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস ; শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারাই শ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটবে। মার্কসের এই তত্ত্ব নিছক ব্যক্তিগত উপলব্ধিজাত নয়। বিদ্রোহ, সংঘর্ষ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সমাজের যে নিহিত নিয়ম কাজ করে এবং যে নিহিত সামাজিক উপাদানের আত্মপ্রকাশ ঘটে, সেগুলোই এই তত্ত্বের ভিত্তি। সমাজের কর্মকান্ড এবং শ্রেণীসংগ্রাম থেকে যে উপাদানগুলো বেরিয়ে আসে, ইতিহাসের বিকাশের নিয়মগুলোর প্রেক্ষাপটে সেগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণের পথেই তত্ত্বের জন্ম দিতে হয়। এই কাজে ব্যক্তির ভূমিকা অবশ্যই আছে। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং, শিবদাস ঘোষ এই ভূমিকাই পালন করে গেছেন।

জমিদারিপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই আসলে ইংরাজ শাসকের বিরুদ্ধেই ছিল

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে **কমরেড শিবদাস ঘোষ নানা আলোচনায় বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে, জমির অধিকার এবং ট্যাক্সকে কেন্দ্র করে জমিদারদের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ রেভেনিউ অফিসারদের বিরুদ্ধে তথা তাদের সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের এবং চাষীদের যেখানে যত ছোট ও বড় সংগ্রাম ও সংঘর্ষ হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে জাতীয়তাবাদী উপাদান বিদ্যমান ছিল।** এই ঐতিহাসিক সংগ্রাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে কৃষক সম্প্রদায়ের শ্রেণীসংগ্রামের সূচনা। কিছু লোকের মতে ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহ শুধু সিপাহীদেরই বিদ্রোহ ছিল, বড় বড় যেসব রাজাদের রাজত্ব ব্রিটিশের দখলে গিয়েছিল তারাই সেগুলো ফিরে পাবার জন্য এই বিদ্রোহ করিয়েছিল ইত্যাদি। কমরেড ঘোষ দেখিয়েছিলেন যে, এগুলো সত্যি হলেও, এগুলোই সব নয়। ঐ সময়ে বিহারে কৃষক বিদ্রোহ এবং সংঘর্ষ হয়েছিল, বাংলায়ও কৃষকবিদ্রোহ হয়েছিল। কমরেড ঘোষ এই ঘটনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এইসব বিদ্রোহগুলো ঘটেছিল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে, পরস্পর সম্পর্কিত ও সুসংগঠিত ভাবে নয়। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ভারতের কৃষকদের শ্রেণীসংগ্রামের এই ছিল শুরু। ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই দিকটি অস্বীকার করা চলেনা। সমস্ত অংশের গরিবরা এতে যোগ দিয়েছিল, আদিবাসীরা সমেত এমন কি সেই অংশের কৃষকরাও এতে যোগ দিয়েছিল, যাদের চাষবাস বন্ধ করে দিয়ে জমিদাররা খেতমজুরে অর্থাৎ কিনা গ্রামীণ সর্বহারায় পরিণত করার রাস্তা প্রশস্ত করছিল। এটাও একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার নিদর্শন।

১৮৫৭-র বিদ্রোহ সম্পর্কে মার্কসের যত নোট আছে, সবজায়গাতেই তিনি দেখিয়েছেন সেই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে ভারতের সর্বত্র তাদের রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা খাড়া করেছিল। কোম্পানি কীভাবে ট্যাক্স আদায়ের জন্য নানান উপায় অবলম্বন করছিল। পূর্ব ভারতে তারা এই উদ্দেশ্যে জমিদারিপ্রথা চালু করেছিল, কিন্তু সারা দেশে আর কোথাও তা চালু ছিলনা। উত্তর ভারতে জায়গিরদাররা নিজেরাই কোম্পানির সঙ্গে বোঝাপড়া করে রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি ঠিক করে নেয়। পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতের কোথাও কোথাও প্রশাসন এবং রায়তরা এই কাজ সরাসরি করত। কিন্তু এই সরাসরি রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতির পরিণাম কোম্পানির শাসন বজায় রাখার প্রশ্নে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলে উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ প্রশাসকরা এবং কোম্পানির কর্তারা মনে করতে থাকেন। কারণ, সেক্ষেত্রে প্রশাসন এবং রায়তদের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য এমন কোনও তৃতীয় পক্ষ থাকবে না যে ইংরাজ রাজশক্তির অনুকূলে রায় দিতে পারে। আর, তাহলে প্রশাসন আর জনগণের মধ্যে সোজাসুজি লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠবে। অতএব ব্রিটিশ রাজশক্তি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের মাঝখানে তৃতীয় একটি পক্ষ খাড়া করা হল, যে কর ও ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করে সরকারকে জমা দেবে। এইভাবে জমিদারি প্রথা প্রবর্তন করা হল। কাজেই জমিদারদের বিরুদ্ধে যে লড়াই তা আসলে ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেই লড়াই। ট্যাক্স আদায়ের জন্য সমস্ত জায়গায় গ্রামের গরিবদের এবং আদিবাসীদের ওপরেই জমিদাররা শোষণ, জুলুম, অত্যাচার চালিয়েছে এবং ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই শুরু হয় আদিবাসী বিদ্রোহ। এমন কিছু ঐতিহাসিক আছেন যাঁরা বলেন, এই আদিবাসী বিদ্রোহ স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিলনা, ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই ছিলনা — ছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই। তাঁরা এটা খেয়াল করেননি যে ইংরেজ সরকার বুঝেশুনেই জমিদারদের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছিল।

তিলকা মাঝি-সিধু-কানু-বীরসা মুন্ডার লড়াই জমিদারদের জুলুম এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তো ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু মৌলিক বিচারে এ লড়াই ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধেও। এ ছিল ইংরেজের চালু করা রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই। জঙ্গলের কাঠ, ফল এবং জমির ওপর আদিবাসীদের যে অধিকার ছিল তা জমিদারী প্রথা কেড়ে নেয়। এর ফলে জঙ্গলের সামগ্রী এনে আদিবাসীরা যে কোনমতে দিন গুজরান করত তাও বন্ধ হয়ে যায়। যে আবাদী জমি আদিবাসীরা জঙ্গল হাসিল করে হাড়ভাঙা পরিশ্রমে আবাদ করেছিল, রাতারাতি শুনল সেই জমি তাদের নয় — জমিদারের এবং জমিদারকে ট্যাক্স না দিয়ে সেখানে চাষের অধিকার তাদের নেই। জমিদারেরা বন্দুকের জোরে আদিবাসীদের জমি এইভাবে ছিনিয়ে নেয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে কশাত্‌কারী (কৃষক) আইন অনুসারে আদিবাসীদের জমি অন্য কোনও সম্প্রদায়ের মানুষের কেনার অধিকার ছিলনা ; কিন্তু গরিব আদিবাসীকে টাকা দিয়ে তার নামে ঐ জমি অন্য সম্প্রদায়ের বড়লোক বেনামে কিনে নিত। এইভাবেও আদিবাসীরা জমি হারিয়েছে। এ ছাড়াও, কোনমতে জমিদারকে ট্যাক্স দিয়ে যেসব আদিবাসী নিজেদের জমি রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল, মহাজন এবং ব্যবসায়ীরা তাদের ঠকিয়ে জমি নিয়ে নেয়। স্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ও ধনী চাষী এবং ব্যবসায়ীরা পুলিশ ও প্রশাসনকে টাকা খাইয়ে রাতারাতি আদিবাসীদের জমি আত্মসাৎ করেছে। এই হল আদিবাসী বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ভারতের চাষীদের শ্রেণীসংগ্রাম গোড়ার দিকে অসংগঠিত ও বিক্ষিপ্ত ছিল, কতকগুলো জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং তখনও পর্যন্ত একটা সংঘবদ্ধ রূপে গড়ে ওঠেনি, একথা সত্যি। কিন্তু সেই শ্রেণীসংগ্রামের উপাদান এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ঐতিহাসিকভাবে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই হল সিধু-কানুর আন্দোলনের প্রেক্ষাপট।

চারের পাতায় দেখুন

আদিবাসী সমাজও শ্রেণীবিভক্ত

তিনের পাতার পর

সিধু-কানু দিবস পালনের যথার্থ তাৎপর্য

আমরা যখন সিধু-কানু দিবস পালন করব, তখন তার একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকা উচিত। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিখিয়েছেন, স্মৃতিচারণের সঠিক পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত। পুঁথিপড়া ইতিহাসবিদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আজ এই স্মৃতিচারণ করার কোন মানে আছে কি ? না। কেননা, এহেন স্মৃতিচারণ হবে নিছক আনুষ্ঠানিকতা। ইতিহাসই যে স্মৃতিচারণের ভিত্তি হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করার দ্বারা সেই সময়ের সামাজিক ঘটনাবলীর যথার্থ স্বরূপকে উপলব্ধি করার ভিত্তিতে এই দিনটিকে স্মরণ করতে হবে। কোন্ নৈতিকতাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে সিধু এবং কানু লড়াইতে নেমেছিল তা বুঝতে হবে। কোন্ কর্তব্যবোধ বীরসা মুন্ডাকে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা উপলব্ধি করতে হবে। এদের জীবনের ঘটনাবলী তো ইতিহাসের বইতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্ নৈতিকতাবোধ ও কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং কোন্ শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি থেকে এরা লড়াইতে এসেছিল এবং আত্মাহুতি দিয়েছিল, তার ব্যাখ্যা কোনও ইতিহাস বইতে মেলে কি ? আজকের সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইতে আজ কোন্ নৈতিকতাবোধ এবং কর্তব্যবোধ নিয়ে আমরা চলব, আর সেই সময়ের সমাজে এইসব বিপ্লবীরা কোন্ নৈতিকতা ও কর্তব্যবোধ নিয়ে লড়েছিলেন, এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায় এবং সম্পর্ক কোথায়, দুই-ই আমাদের বুঝতে হবে। কারণ, আমরা আজ যে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে আছি সেটিও এদের শ্রেণীসংগ্রামের ধারা বেয়েই এসেছে। তারাও শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত ছিল, আমরাও শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত আছি; কিন্তু সমস্যাগুলোর চরিত্রের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে, তত্ত্বের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে, লড়াইয়ের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যও মৌলিকভাবে পাল্টে গেছে এবং লড়াইয়ের কর্মপদ্ধতিতেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এখানে তাঁদের সঙ্গে যেমন আমাদের একটা সম্বন্ধ আছে, তেমন একটা জায়গায় পৌঁছে বিচ্ছেদও আছে। যারা বিপ্লবী নয়, শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী নয়, যারা শ্রেণীসমন্বয়ের বাণীই বলে এবং সেই তত্ত্বই প্রচার করতে চায় তারা এইভাবে বিশ্লেষণের কথা চিন্তাও করেনা। তাদের কাজ তো মূর্তিতে মালা চড়ানো, তাদের মূল্যায়নও ওখানেই খতম। কিন্তু বিপ্লবীমাত্রই জানে যে আমরা সকলেই নিরন্তর পরিবর্তনের প্রবাহের মধ্যেই আছি, গতিশীলতার মধ্যে আছি, গতিশীলতার মধ্যে থাকার মধ্য দিয়েই প্রত্যেকে তার নিজস্ব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছি। এই সত্যকে যারা বুঝবে তারা এও বুঝবে যে আমাদের আজকের আন্দোলনের বীজ আছে অতীতের আন্দোলনের গর্ভেই। এই ঋণ আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা তিলকা মাঝি, সিধু, কানু এবং বীরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা জানাই। তাঁরা আজকের বিপ্লবীদের পূর্বসূরী। তাঁরা না থাকলে আজ আমাদেরও সৃষ্টি হতনা, আমাদের আন্দোলনও গড়ে উঠতে পারত না। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই দিকটিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাদের শিখিয়েছেন।

এই শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বর্তমানে ভারতবর্ষের আদিবাসী সহ অন্যান্য উপজাতিগুলোর খেটেখাওয়া জনসাধারণের জীবনের সত্যিকার অবস্থাকে বিচার করে দেখতে হবে। ভারতবর্ষ একটা বিশাল দেশ, যার এক একটা জায়গা এক এক রকম। যারা আদিবাসী তাদেরও স্বরূপ, চরিত্র, বিকাশের স্তর, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনেক প্রভেদ আছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ সবই তো আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্য। এই সব রাজ্যে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় আছে যাদের নিজস্ব রীতি-রেওয়াজ, নিজস্ব সংস্কৃতি এবং নিজস্ব ভাষা আছে। ভারতবর্ষের সর্বত্র আদিবাসীরা আছে। আমি যতদূর জানি, দক্ষিণ ভারতে গিরিজন এবং টোডারা আছে। রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে গোন্দ, ভীল, কোল আছে। ওড়িশাতেও নানা ধরনের আদিবাসী আছে। ঝাড়খন্ডে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, হো আছে। নাগাল্যান্ডে যে নাগারা থাকে তাদের মধ্যে আবার নাগাআব, নাগাজেমা, নাগাঅঙ্গামী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাগ আছে। মিজোরামেও অধিকাংশ আদিবাসী যেমন মিজো, তেমন অন্য আদিবাসী সম্প্রদায়ও কিছু আছে। মেঘালয়ে গারো, খাসি, মিকির সম্প্রদায় আছে। ভারতবর্ষের চিত্রটি ঠিক মতো নজর করলে দেখা যাবে যে এখানে কেবল প্রধান প্রধান কয়েকটি উপজাতিরই বাস তা নয়, বরং তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যা কম এমন উপজাতি এখানে বিরাট সংখ্যায় আছে, যাদের মধ্যে আদিবাসীরাও পড়ে। ভারতের আদিবাসীদের সমস্যাগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা না করে ভারতবর্ষের সমস্যাবলীর সমাধান করা যাবেনা।

আদিবাসীদের সর্বহারায় রূপান্তরিত হওয়া

ব্রিটিশ আমল থেকেই আদিবাসীদের সর্বহারায় রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া চালু আছে। মনে করে দেখুন, আসাম ও উত্তরবঙ্গের চা বাগানে কাদের খাটতে পাঠানো হয়েছিল ? — ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের। আসামে বোড়ো-ল্যান্ডের সমর্থক বোড়ো সম্প্রদায়ের জনসাধারণের সঙ্গে যে আদিবাসীদের অবিরাম সংঘর্ষ চলছে, তারা কারা ? এরা সাঁওতাল, যারা বহু বছর আগে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছিল এবং তারপর এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে। চা বাগানে খাটার জন্য এবং সীমান্ত বরাবর রাস্তা বানাবার জন্য নিজেদের বাসস্থান, জমি, গ্রাম থেকে এদের উৎখাত করে আনা হয়েছিল। ছোটনাগপুর অঞ্চলে কয়লা, অভ্র, ক্রোমাইট, ডোলোমাইট ইত্যাদির যত খনি আছে, সর্বত্র ব্রিটিশ আমল থেকে কারা মজুরের কাজ করে আসছে ? এখানেও সেই আদি-বাসীরাই। রাঁচীতে হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন গড়ে তোলার সময়ে ধুর্বা, হাতিয়া ইত্যাদি জায়গায় যে সমস্ত গ্রামগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই গ্রামগুলোতে থাকত কারা ? থাকত ওঁরাও, মুন্ডা সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা। কোথায় গেল তারা ? কুলিতে পরিণত হল, সর্বহারা শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়ে গেল, তাদের পুনর্বাসনও হলনা। যেখানে যেখানে বড় বড় প্রোজেক্ট হয়েছে — বর্তমানেও নর্মদার ওপর যে বিশাল বাঁধ তৈরি হচ্ছে — সেই সব জায়গায় কাদের গ্রামগুলো উৎখাত হয়ে যাচ্ছে, কাদের গ্রাম শ্মশানে পরিণত হচ্ছে, কাদেরকে ভিটেছাড়া করা হচ্ছে ? সব জায়গায় প্রধানত আদিবাসীদেরই উৎখাত করা হচ্ছে। বাংলা-বিহার সীমান্তে যে দামোদর বাঁধ তৈরি হয়েছিল তাতেও বাংলার অন্তর্গত ঝাড়খন্ডের আদিবাসীরাই উৎখাত হয়েছিল।

এই সবকিছুর ফলে এই আদিবাসীরা জমি থেকে, গ্রাম থেকে এবং সামাজিক জীবন থেকে ছিন্নমূল হয়ে গেছে। এক গ্রামের বাসিন্দা থাকতে এরা যেভাবে মিলেমিশে চলত, পরিবারে পরিবারে যে সম্পর্ক গড়ে উঠত, প্রতিবেশীদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠত, একে অন্যের প্রতি যে দায়বদ্ধতা অনুভব করত এবং এই প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যে যে সামাজিক আবেগ-অনুভূতির জন্ম হত, এই সমস্ত কিছু একেবারে বিধবস্ত হয়ে গেছে। তাদের যেমন বাস্তুচ্যুত করে জায়গায় জায়গায় খাটতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমন তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধকেও চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। কাজ করো, পয়সা নাও, তারপর যা মর্জি হয় তাই করো — এই ছাঁচে তাদের ঢেলে ফেলা হয়েছে। সর্বহারায় রূপান্তরিত করার এই যে প্রক্রিয়া, ভারতে আদিবাসীদের মধ্যেই তা সবার আগে শুরু হয়েছে। অন্যান্য উপজাতির গরিব জনসাধারণ, যাদের তপশিলী জাতি বা জনজাতি ইত্যাদি বলা হয়, এই প্রক্রিয়ায় সামিল হয়েছে এর পরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এর শুরু।

এদেরকে বিদেশেও পাঠানো হয়েছে, যাদের অভিবাসী মজদুর বা ইমিগ্র্যান্ট লেবার বলা হয়। মরিশাস, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়াতে এদের পাঠানো হয়েছে। এদের নিজের সম্পদ বলতে কিছু ছিলনা — না জমি, না কাজের হাতিয়ার। মেহনত করে রোজগার করবার জন্য মুচির, রাজমিস্ত্রির, কামারের বা কুমোরের যেমন নিজের হাতিয়ার থাকে তেমন কোনও কিছুই এদের ছিলনা। ছিল শুধু শ্রম করার ক্ষমতা। সে শ্রম কে কিনবে ? যার কাজে লাগবে সে কিনবে। দরকার না থাকলে সে কিনবে না। কাজ শেষ হলে, সম্পর্কও শেষ। এইভাবে আদিবাসী, তপশিলী জাতি এবং জনজাতির গরিব মানুষদের মধ্যেই সর্বহারায় পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া সবার আগে শুরু হয়েছিল। আদিবাসীদের ইতিহাসে, গরিব তপশিলী জাতিগুলোর ইতিহাসেই এই তথ্য পাওয়া যায়। এই সত্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। কাজেই, তিলকা মাঝি, সিধু, কানু, বীরসা মুন্ডা জমিদার আর ইংরাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়েছিল, রক্ত ঝরিয়েছিল, জেলে গিয়েছিল, প্রাণ দিয়েছিল শুধু এইটুকু বললেই তাদের সঠিক এবং সত্যকার ছবি পাওয়া যাবেনা।

আদিবাসী সমাজও শ্রেণীবিভক্ত

মনে রাখতে হবে, সর্বহারাতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া আজও চালু আছে, কিন্তু এখন তা ভিন্ন রূপে হচ্ছে। একথাও সত্যি যে এদের মধ্য থেকেই একটা অংশ আবার মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী হিসেবেও গড়ে উঠছে। আদিবাসীদের মধ্যে, তপশিলী জাতিগুলোর মধ্যে এবং জনজাতিগুলোর মধ্যে এখন খানিকটা দূর পর্যন্ত শিক্ষাবিস্তার হয়েছে, দক্ষ কর্মীও তৈরি হচ্ছে। কিন্তু দক্ষ কর্মীও তো সর্বহারাই। আবার এদের মধ্যে একটা মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে যারা সমাজের ওপরতলায় উঠে গেছে, ম্যানেজার সম্প্রদায়ের মধ্যে চলে গেছে, ফোরম্যানের স্তরে চলে গেছে। নিতান্ত মুষ্টিমেয় হলেও কিছু আদিবাসীর হাতে বহু আদিবাসীর জমি এসে জড়ো হয়েছে, যারা আদিবাসীদেরই শোষণ করছে। আদিবাসীদের নিজেদের মধ্যেও শ্রেণীসংগ্রামের রূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আদিবাসীদের একটা বিরাট অংশ খনিতে খাটছে, খেতমজুরের কাজ নিয়ে এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে গিয়ে জমিতে খাটছে। কেননা, এদের কিছুই সম্বল নেই, জোত-জমি খুইয়ে বসেছে। মেহনত করে খাওয়া ছাড়া এদের আর উপায় নেই। এই অবস্থা সব থেকে বেশি আদিবাসী, তপশিলী জাতি এবং জনজাতিগুলোর মধ্যে দেখা যায়। সর্বহারায় রূপান্তরিত হওয়ার পরিণতিতে এরা 'মাইগ্র্যান্ট লেবার' বা যাযাবর শ্রমিক রূপে কাজের খোঁজে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ায়। গুজরাটে, মহারাষ্ট্রের বন্দরগুলোতে, সবজায়গায় এরা আছে।

আদিবাসীদের ভাষা এবং লিপির সমস্যা

আদিবাসীদের অন্য আর একটি যে গুরুতর সমস্যা, তা হল তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং নিজস্ব ভাষার বিকাশের সমস্যা। সংবিধানে বলা আছে — সকলের বিকাশের সমান অধিকার আছে, সমান সুযোগ আছে, কিন্তু বাস্তবে তা আছে কই ? কেবলমাত্র সাঁওতালি ভাষার নমুনা দেখা যাক। সাঁওতালি ভাষায় সাহিত্য আছে। কিন্তু তা আছে নানান লিপিতে লিখিত হয়ে। তা বাংলায় বাংলা লিপিতে, ঝাড়খন্ডে দেবনাগরী লিপিতে, ওড়িশাতে ওড়িয়া লিপিতে। এর ওপরে আছে চতুর্থ লিপি 'অল্‌চিকি'। পঞ্চম লিপি হল রোমান লিপি, যাতে সাহিত্য লেখা হয়েছে নামমাত্র। এখন এই অবস্থার পরিণাম কী ? যদি বাংলার সাঁওতালদের দেবনাগরী লিপিজ্ঞান না থাকে, দেবনাগরীতে লেখা সাঁওতালি সাহিত্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটবে না। তেমনই বাংলা লিপি যার জানা নেই সে সাঁওতাল হলেও বাংলায় লেখা সাঁওতালি সাহিত্যের স্বাদ থেকে সে বঞ্চিত থাকবে। ওড়িয়া লিপিতে লেখা সাঁওতালি সাহিত্যও অন্য সাঁওতালদের কাছে অজানিত থাকবে। একটা সাধারণ লিপির বিকাশ ঘটাতে না পারা পর্যন্ত সমস্ত সাঁওতালদের জন্য সাঁওতালি ভাষায় একটা সাধারণ সাহিত্য গড়ে ওঠা তাহলে কত দুরূহ। তাই, কোন একটা সুনির্দিষ্ট লিপি নিতেই হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের দিক থেকে কোনও সহায়তা আসছে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তরফে সহায়তা আসছে না। কাজ যতটুকু হচ্ছে তা ব্যক্তিগত উদ্যোগে হচ্ছে। যেমন পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর প্রচেষ্টায় 'অল্‌চিকি' লিপির বিকাশ। এই 'অল্‌চিকি' একটা সাধারণ লিপি হতে পারত। কিন্তু, এ ব্যাপারে সকলে এখনও পর্যন্ত একমত নন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অল্‌চিকি লিপিকে স্বীকৃতি দিয়েছে — কিন্তু সাঁওতালি ভাষাকে স্বীকৃতি দেয়নি। সরকার লিপিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে, কিন্তু ভাষাকে স্বীকৃতি দিচ্ছেনা ! এর কি কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি হয় ? যে ভাষার লিপিকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে সেই ভাষাকেও অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে। আবার, কোনও ভাষাকে যদি স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে সেই ভাষায় বই লেখাও চালু করতে হবে। দেখতে হবে যাতে অন্তত প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি স্তরে সমস্ত ক্লাসে সাঁওতালি ভাষায় লেখাপড়া চালু হতে পারে। সেটা যতদূর পর্যন্ত করা সম্ভব ততদূর পর্যন্ত সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। কিন্তু এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এই স্বীকৃতি ওড়িশাতেও দেওয়া হয়নি এবং বিহারেও দেওয়া হয়নি। একইভাবে প্রশ্ন উঠেছে যে ঝাড়খন্ডের সরকারি ভাষা কি হবে ? এখানে

সাতের পাতায় দেখুন

ইরাক থেকে মার্কিন সৈন্য ফিরতে চায়

ওদের দেশে ফিরিয়ে আনো

ইরাকে মার্কিন সৈন্যরা ঘরে ফেরার দাবি তুলেছে। যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। সেটা কেবল এজন্যই নয় যে, দমবন্ধকরা বর্ম পরে তাদের থাকতে হচ্ছে, অথবা সামরিক খাবার খেতে হচ্ছে, অথবা পরিবার থেকে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। যদিও এগুলো সবই খাঁটি অভিযোগ। এমনকি প্রতিদিন বাড়তে থাকা মৃত্যুর সংখ্যাও এর কারণ নয়। বহু যুদ্ধেই দিনে দুই বা এমনকি ১০ জন সেনার মৃত্যুকেও সামরিক কর্তারা 'স্বাভাবিক' বলে মেনে নেন, সাধারণ সৈন্যদেরও না মেনে নিয়ে উপায় থাকে না।

কিন্তু এতো একটা যুদ্ধ নয়। প্রবল বিধ্বংসী হাইটেক বিমান আক্রমণের আকস্মিকতায় প্রতিপক্ষকে

ইরাকি গেরিলাদের রকেট আক্রমণে মার্কিন সাঁজোয়া গাড়ি জ্বলছে

হতবুদ্ধি করে দিয়ে এই যুদ্ধ জেতা হয়েছিল। এটা বাস্তবে দখলদারি এবং যতই দখলের চাকা মানুষকে পিষতে পিষতে এগোচ্ছে, সৈন্যরা ধরতে পারছে এই ভয়াবহ যুদ্ধের পিছনে যেসব যুক্তি দেওয়া হয়েছিল তা সবই মিথ্যা। সৈন্যরা রাস্তায় টহল দিচ্ছে, কিন্তু ওরা জানে ইরাকের মানুষ ওদের ঘৃণা করে। এর কারণও জানা। ঐ সৈন্যরা দেশ-দখলদার। ওরা কাজ করছে ধনকুবেরদের হয়ে যারা ইরাকের মাটির সমস্ত রস শুষে বাইরে নিয়ে যেতে চায়। নিরাপদে এই লুঠ চালাতেই ধনকুবেরদের সৈন্য প্রয়োজন। সেনারা আগে একথা বোঝেনি।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দেশ থেকে বিতাড়নের শপথ নিচ্ছে ইরাকি যুবকরা

তাদের বলা হয়েছিল, অত্যাচারিত জনগণকে তারা মুক্ত করতে যাচ্ছে। এখন জনগণ সৈন্যদের স্পষ্ট ভাষায় বলছে — অনেক হয়েছে, আমরা এ ধরনের 'মুক্তি' চাইনা, তোমরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও। সৈন্যরা ওদের মুখের ভাষা না বুঝলেও, গোপন হামলায়, ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে ও বিপন্ন পরিবারগুলির চোখের জলে যে ভাষা ফুটে বেরোচ্ছে, তা বুঝে নিতে সৈন্যদের অসুবিধা হচ্ছে না।

এদিকে মার্কিন দেশে রাজনীতিকরা ছোটাছুটি করছে নতুন ফর্মূলার খোঁজে — যা দিয়ে আক্রমণ ও দখলদারির মূল লক্ষ্যকে এখন বাঁচিয়ে হাসিল করা যায়। লক্ষ্য একটাই। তা হচ্ছে, ইরাকের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া এবং তার তেলসম্পদকে মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কবজায় রেখে দেওয়া। হোয়াইট হাউসের কর্তাদের আর একটা দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্যও ছিল — অন্তহীন যুদ্ধ চালিয়ে আমেরিকাকে এমন একটা শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করা — যার বিরুদ্ধতা করার চিন্তাও, বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলি দূরের কথা, আমেরিকার অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী মিত্ররাও করতে পারবেনা।

রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয়পক্ষই এই লক্ষ্যের সমর্থক থাকলেও এখন উভয়কেই ভাবতে হচ্ছে — এই লক্ষ্য হাসিল করার জন্য ইরাককে বেছে নেওয়া সম্ভবত ঠিক হয়নি।

ফলে, পেন্টাগন ও তাদের অসামরিক মাতব্বররা নিজেদের টেকনোলজির ক্ষমতার গর্বে যখন মদমত্ত ছিল, তখন প্রশাসন যেসব দেশকে উপেক্ষা করতে পেরে খুশি হয়েছিল, আজ সেই দেশগুলোকেই বন্ধু বলে বুকে টেনে নেওয়ার কাজটি অনিচ্ছার সঙ্গেই করতে হচ্ছে কলিন পাওয়েলকে।

প্রশাসন এখন চায় ইরাকে আমেরিকার দখলদারির উপর রাষ্ট্রসংঘের আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক এবং সৈন্য রাখার ব্যয়ের একটা মোটা অংশ দিক অন্যান্য দেশ। কিন্তু ফ্রান্স, জার্মানি ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরা ভালই বোঝে কখন তাদের মিত্ররা/শত্রুরা পাঁকে পড়েছে। এখন তাই কঠিন দরকষাকষি চলছে।

জর্জ বুশ যখন বিপুল অর্থ ব্যয় করার পরও আবার কংগ্রেসের কাছে ৮৭০০ কোটি ডলার চাইলেন, তখনই রাজনীতিকরা টের পেলেন এই বিশাল সামরিক ব্যয় নিয়ে জনসাধারণের ক্ষোভ উত্তরোত্তর বাড়ছে। ক্রমাগত যখন বাজেটে ছাঁটাই চলছে, সাধারণ মানুষের দিনযাপন ক্রমাগত দুঃসহ হচ্ছে, তখন এই বিশাল ব্যয়

'ইরাক থেকে মার্কিন সৈন্য ফিরিয়ে আনো'। ১০ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে রামসফেল্ডের সাংবাদিক সম্মেলনের বাইরে বিক্ষোভ

হাততালি দেওয়া রাজার অনুগত প্রজাদের পক্ষেও সহজ নয়।

এই বাস্তব অবস্থা আবার রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীদের — যার তালিকা ক্রমাগত বাড়ছে — বাগাড়ম্বরের সুযোগ করে দিয়েছে। এই তালিকায় পিছনের দিকে নাম রয়েছে এমন অনেক নবাগতের মুখে এখন শান্তির বুলি ফুটছে। মনে রাখা দরকার যে, মাত্র কয়েকমাস আগেই বুশকে যুদ্ধে এগিয়ে যেতে অনুমোদন দিয়েছিল আমেরিকান পার্লামেন্ট। হিলারি ক্লিন্টন, টমাস ডড, টম ড্যাশলে, জন কেরি প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ডেমোক্র্যাটিক লিবারেলরা, রিপাবলিকানদের সাথে হাত মিলিয়েই যুদ্ধের সপক্ষে ভোট দিয়েছিল।

রাজনীতিকরা তাদের কথা বলেছে। এখন জনগণের বলার পালা। ২৫ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর বিশ্বজুড়ে আওয়াজ উঠেছে — ইরাক ও প্যালেস্তাইন থেকে হাত ওঠাও।

আমেরিকার জনগণই পারে ইরাকের উপর মার্কিন দখলদারির অবসান ঘটাতে। ২৫ অক্টোবর দেশজোড়া আওয়াজ উঠবে — দখলদারি বন্ধ কর, সৈন্যদের ঘরে ফিরিয়ে আনো।' শ্রমজীবী জনগণের উপর আর্থিক আক্রমণ বন্ধেরও দাবি উঠবে একই সাথে। বাগদাদ, তিকরিট ও বসরায় — ইরাকি জনগণ ও অনিচ্ছুক মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যরা তা শুনবে ও আনন্দিত হবে।

(ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পত্রিকার (২৫-৯-০৩) সম্পাদকীয় অবলম্বনে)

শিক্ষক খুনের প্রতিবাদে ঝালদায় বন্‌ধ

গত ১৬ সেপ্টেম্বর এলাকার সমাজবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রাণ হারাতে হল ঝালদা থানার ব্রজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্মলেন্দু চ্যাটার্জীকে। যাত্রীবোঝাই বাস থামিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে দুষ্কৃতিরা প্রতিবাদী শিক্ষককে গুলি করে হত্যা করে পালিয়ে যায়। এইরকম জঘন্য ঘটনার পরও পুলিশের অস্বাভাবিক নীরবতা এলাকার মানুষকে একদিকে সন্ত্রস্ত, অপরদিকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এমতাবস্থায় এস ইউ সি আই ঝালদা থানা কমিটির পক্ষ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর ঝালদা থানা বন্‌ধ পালনের আহবান জানানো হয়। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে ঝালদা থানার মানুষ এই বন্‌ধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সফল করে তোলেন। বন্‌ধের দিনই দলের পক্ষে দোষীদের শাস্তির দাবিতে ঝালদা থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বন্‌ধ ও ডেপুটেশনের চাপে পুলিশ দু'দিনের মধ্যেই দোষীদের গ্রেপ্তার করে।

এই ঘটনা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলার আসল পরিস্থিতি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। প্রতিবাদী মানুষের প্রাণের নিরাপত্তাও আজ এ রাজ্যে নেই। সি পি এম যথারীতি এই ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে ডাকা বন্‌ধের বিরোধিতা করে তাদের দেউলিয়া রাজনীতিকে আরেকবার প্রকট করলো। খবরে প্রকাশ, ঘটনায় জড়িত যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা এস এফ আই-এর সদস্য।

২২ সেপ্টেম্বর ডি এস ও পুরুলিয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ঝালদা থানায় ছাত্র প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়েছে।

‘বিদ্যুৎ আইন ২০০৩’ ও সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা

একের পাতার পর

টাকা, মুন্সিয়ানার সাথে সি পি এম নেতা তার লেখায় এ তথ্য গোপন করে গিয়েছেন।

নয়া আর্থিক ও শিল্পনীতি গ্রহণের পর থেকেই বিদ্যুৎক্ষেত্রগুলিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। নরসীমা রাওয়ের কংগ্রেস সরকার, কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি সরকার এবং সি পি এম সমর্থিত দু-দফার সংযুক্ত মোর্চা সরকার ক্রমাগত লাভজনক রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রকে দেশি-বিদেশি পুঁজির হাতে তুলে দিয়ে বেসরকারীকরণের পথ প্রশস্ত করতে থাকে। শেষপর্যন্ত কেন্দ্রের তৃণমূল-বিজেপি সরকার ২০০১ সালের বিদ্যুৎ বিল এবং তার চূড়ান্ত পরিণতি ২০০৩ সালের বিদ্যুৎ আইন রচনার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎক্ষেত্রকে পাকাপাকিভাবে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছে, যার দ্বারা বিদ্যুতের মত একটি অত্যাবশ্যক পরিষেবাকে লাভজনক পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে। এই আইন গেজেটভুক্ত করা হয়েছে ২ জুন ২০০৩ এবং কার্যকর করা হয়েছে ১০ জুন ২০০৩ থেকে।

কী আছে এই নয়া বিদ্যুৎ আইনে

নতুন এই বিদ্যুৎ আইনে বলা হয়েছে —

(১) রাজ্য সরকারগুলোর সাথে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় বিদ্যুৎনীতি রচনা করবে।

(২) সব রাজ্য সরকারকে এক বছরের মধ্যে “বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন” গঠন করতে হবে এবং এই কমিশনই মাশুল নির্ধারণ এবং মাশুল নিয়ে বিরোধের মীমাংসার ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবে। এই কমিশনই বণ্টন ও সঞ্চালনে ইচ্ছুক সংস্থাকে অনুমোদন দেবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে এবং **রাজ্য সরকার রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে জনস্বার্থে কোন বিষয়ে লিখিত কোন নির্দেশ দিলে তা কমিশনকে মেনে নিতে হবে।**

(৪) উৎপাদন, সঞ্চালন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে একই সংস্থার হাতে না রেখে তিনটি কোম্পনিতে বিভক্ত করা এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে সরকারি কোম্পানিতে পরিণত করা যাবে।

(৫) বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপন বা পরিচালনার জন্য কোন লাইসেন্স লাগবে না। যেকোন ব্যক্তি বা কোম্পানি ইচ্ছা করলেই নিজস্ব (ক্যাপটিভ) উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করে নিতে পারবে। সেক্ষেত্রেও উৎপাদন, সঞ্চালন, বণ্টনে লাইসেন্স লাগবে না, হুইলিং চার্জ বা সারচার্জও লাগবে না।

(৬) রাজ্য সরকার ও বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সাথে আলোচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের নীতি ঠিক করবে। এই গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের কাজে পঞ্চায়েত বা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে কাজে লাগানো হবে।

(৭) বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করতে হবে ঃ (i) বাণিজ্যিক নীতির ভিত্তিতে, (ii) বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিবহনের খরচই হবে বিদ্যুৎ মাশুল, (iii) রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নির্দেশ মতোই পারস্পরিক ভর্তুকি ধাপে ধাপে কমিয়ে তুলে দেওয়া হবে। রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তার সময়সীমা নির্ধারণ করবে।

(৮) গ্রাহকদের বিদ্যুতের জন্য সিকিউরিটি চার্জ দিতে হবে। সিকিউরিটি চার্জ না দিলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ, এমনকি লাইন কেটে দেওয়া হতে পারে। তবে সিকিউরিটির উপর ব্যাঙ্ক রেটে সুদ দিতে হবে।

(৯) বিরোধ দেখা দিলে কোন কোর্টে মামলা করা চলবে না। কোন কোর্টের হস্তক্ষেপও চলবে না। বিরোধ হলে লাইসেন্সি নিয়োজিত অফিসার বিচার করবে — তাতে গ্রাহক সন্তুষ্ট না হলে এক-তৃতীয়াংশ টাকা ও কমিশন নির্ধারিত ফি দিয়ে কমিশনের কাছে আবেদন করা যাবে। কমিশনের এ্যাডজুডিকেটিং অফিসারের রায়ই এ ক্ষেত্রে শেষ কথা।

(১০) বিদ্যুৎ চুরি ইত্যাদি অভিযোগের ক্ষেত্রে কোন সিভিল কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ক্রিমিনাল কোর্টে বিচার হবে এবং জেল ও জরিমানা দুই-ই হতে পারে।

(১১) রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলে বিশেষ আদালত স্থাপন করতে পারবে এবং সেই আদালতেই বিদ্যুৎ চুরির বিচার হবে।

(১২) বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি হর্স পাওয়ার পিছু ২০ হাজার টাকা দিলে তার বিরুদ্ধে জেল-জরিমানা হবে না — প্রথমবার।

(১৩) কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইনে জনগণকে মূল্যবৃদ্ধির আতঙ্ক থেকে মুক্ত করার জন্য বলা হয়েছে যে, মূল্যবৃদ্ধি নয় — এই আইনে দাম কমানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বণ্টনকারী কোম্পানিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে। এই প্রতিযোগিতার স্বরূপ কী! বর্তমান আইন অনুযায়ী কমিশন আগের মতোই কোম্পানিগুলির মধ্যে এলাকা ভাগ করে দেবে। গ্রাহকরা চাইলে অন্য এলাকার কোম্পানির কাছ থেকেই বিদ্যুৎ কিনতে পারবে, তবে সেক্ষেত্রে তাকে হুইলিং চার্জ (বিদ্যুৎ নিয়ে আসার জন্য চার্জ) দিতে হবে। আবার সেই কোম্পানিকে ও ট্রান্সমিশন কোম্পানিকে হুইলিং চার্জ বা সারচার্জ দিতে হবে। অর্থাৎ গ্রাহককে বর্ধিত দামে কিনতে হবে। তাহলে দাম কমছে কী করে?

ক্যাপটিভ কোম্পানিগুলি বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠীতে পরিণত হবে। কারণ এদের উৎপাদন, বণ্টন ও সঞ্চালনে লাইসেন্স লাগছে না। এমনকি হুইলিং চার্জ বা সারচার্জও দিতে হবেনা। কিন্তু এরা কারা? একটি ক্যাপটিভ কোম্পানি তৈরি করতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা লগ্নী করার ক্ষমতা কাদের আছে? একমাত্র বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থারই এই ক্ষমতা আছে।

এই হল কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর সারমর্ম। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই আইনের উদ্দেশ্য হল —

(১) বিদ্যুতের বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ;

(২) অভিন্ন মাশুলনীতি প্রবর্তন, অর্থাৎ শিল্পপতিদের কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে ছোট গ্রাহকদের কাছ থেকে বেশি দাম আদায় করা;

(৩) বিচারালয়ে গিয়ে বিচার চাইবার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা;

(৪) কমিশনকে সামনে খাড়া করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনস্বার্থবিরোধী চরিত্র গোপন করার চেষ্টা করা;

(৫) বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের পক্ষে আইনী রক্ষাকবচ দৃঢ় করা।

একথা পরিষ্কার, এতদিন বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জন্য যতটুকু সুযোগ সুবিধা রাখা হয়েছিল — বর্তমান আইনে তা একেবারেই তুলে দেওয়া হল এবং বিদ্যুতের মত অত্যন্ত জরুরি পরিষেবাকেও দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের ব্যবসায় পরিণত করা হল।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী এই চরিত্র বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা যেমন দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির লুটের জন্য দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং দিচ্ছে, বিদ্যুৎক্ষেত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি — এই ক্ষেত্রে সি পি এম ও তাদের রাজ্য সরকার চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করছে। সাধারণ মানুষ ও দলের কর্মী-সমর্থকদের তারা বোঝাতে চাইছে ঃ বিদ্যুৎক্ষেত্রে এই সর্বনাশা পরিস্থিতির জন্য দায়ী একমাত্র কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, সি পি এম বা তাদের পরিচালিত রাজ্য সরকারের কোন দোষ নেই, বরং তারা এই বিদ্যুৎ আইনের সরব প্রতিবাদই করেছে এবং এখন আইন পাশ হয়ে যাওয়ার পর তা প্রতিরোধে জনগণকে আহবান জানাচ্ছে। এখানেই রয়েছে সি পি এম নেতৃত্বের মিথ্যাচার, যা ধরা পড়ে যাচ্ছে বুঝেই তারা এখন কেন্দ্রবিরোধী ফাঁকা হুঙ্কার দিচ্ছেন ও সত্য-মিথ্যায় মিশিয়ে প্রচার করে দলের কর্মীদের ও জনগণকে বোকা বানাতে চাইছেন। একথা ঠিক যে, সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্যুতের বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ও দায়িত্বই প্রধান। কিন্তু সি পি এম নেতৃত্ব যেটা চাপা দিতে চাইছে, তাহল, কেন্দ্রীয় নতুন আইন হওয়ার ৩/৪ বছর আগেই সি পি এম পশ্চিমবঙ্গে তার বিধানগুলি কার্যকর করতে শুরু করেছে। অর্থাৎ এই বিষয়ে বিজেপিকে পথ দেখিয়েছে সি পি এম।

শিলিগুড়ির বিফাই বস্তিতে বিদ্যুতের খুঁটি বসানোর দাবিতে ৬ সেপ্টেম্বর পথ অবরোধ

বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর অনেকগুলি বিষয় সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার আগেই কার্যকর করতে শুরু করেছে

কীভাবে আগেভাগেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ আইন ২০০৩’কে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার কার্যকর করতে শুরু করেছে, এবার তা দেখা যাক —

(১) কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইনে পর্ষদকে ভেঙে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বণ্টন — এই তিন ভাগে ভাগ করার কথা বলা হয়েছে। রাজ্য সরকার আগেই তা করে ফেলেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের (WBSEB) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন-এর সঙ্গে (WBPDCL)। আর এই কর্পোরেশনকে সরকার নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি হিসাবে দেখিয়ে ১৬-৩১ শতাংশ মুনাফা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া বণ্টন এবং গ্রামীণ বণ্টন ও বৈদ্যুতীকরণ — এভাবে আরও দু’ভাগে পর্ষদকে ভাঙা হয়েছে। অর্থাৎ এতদিনকার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(২) কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইনে নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। বাস্তব হল, সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার এই কমিশন গঠনের কাজ আগেই শেষ করে ফেলেছে, যখন এই কমিশন গঠন বাধ্যতামূলক ছিল না এবং অনেক রাজ্যেই গঠিত হয়নি।

(৩) অভিন্ন মাশুল নীতি চালু করে পারস্পরিক ভর্তুকি তুলে দেবার কথা বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইনে। সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার এই ব্যাপারে পথিকৃৎ। গত ২৯ মার্চ, ’০৩ রাজ্য বিধানসভায় যে আইন পাশ করানো হয়েছে তার ৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রয়োজনবোধে কমিশন পারস্পরিক ভর্তুকি ধাপে ধাপে কমিয়ে দিতে পারবে। এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয়েছে — “গত ৩রা জানুয়ারি ২০০২ মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক ভর্তুকি প্রথা তুলে দেওয়া হবে। গৃহীত প্রস্তাবে একথাও বলা হয়েছিল যে, এখনই নয়, কিছুদিন পরে এই নীতি কার্যকর করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সহ ১৬ জন এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ও তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে এই নীতিতে স্বাক্ষর করেন। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ যে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তা নয়।” (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০-১২-২০০২)। এই অভিন্ন মাশুল নীতির সমর্থক হওয়ায় এ বছর রাজ্য সরকার পর্ষদকে যে ১০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিত তা তুলে দিয়েছে এবং কমিশন যখন পুনরায় সি ই এস সিতে ২৫ পয়সা ও পর্ষদে ৫২ পয়সা অভিন্ন মাশুল আদায়ে অনুমোদন দিয়েছে, রাজ্য সরকার তাকেও সমর্থন করেছে।

(৪) রাজ্য সরকার গ্রামীণ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম গঠন করেছে — যার কাজই হল গ্রামীণ এলাকায়, বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে বিদ্যুতায়ন ও বণ্টনের কাজ করানো। এর সাথে বিদ্যুৎ শিল্পে বেসরকারীকরণের কেন্দ্রীয় নীতির পার্থক্য কোথায়?

(৫) কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইনে গ্রাহকদের কোর্টে বিচার চাইবার অধিকার হরণ করা হয়েছে। এই আইন চালু হওয়ার অনেক আগেই বিদ্যুৎ চুরি বন্ধের নামে রাজ্য সরকার ‘ভারতীয় বিদ্যুৎ সংশোধনী আইন, পশ্চিমবঙ্গ, ২০০১’ চালু করেছে — যে আইনের মধ্য দিয়ে সাধারণ গ্রাহকদের বিচারালয়ে বিচার প্রার্থনা করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বলতে গেলে রাজ্য সরকারের এই আইন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে এই অগণতান্ত্রিক নীতি প্রণয়নে উৎসাহিত করেছে।

এই হল সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা।

রাজ্য সরকারের ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে কি?

ভবিষ্যতে বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য সি পি এম একটা কথা খুব জোর দিয়ে প্রচার করছে, তাহল, নতুন এই বিদ্যুৎ আইনের ফলে রাজ্য সরকারের আর কোন ক্ষমতাই রইল না। কিন্তু এই কথা কতদূর সত্য?

কেন্দ্রীয় আইনের ৩(১) ধারায় বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা করে ‘জাতীয় বিদ্যুৎ নীতি

আটের পাতায় দেখুন

সিধু-কানুর সংগ্রাম

চারের পাতার পর

সাঁওতালি, ওঁরাও, মুন্ডা, হো, কুর্মী সব ভাষাভাষী মানুষই আছে। কোন্ ভাষা এখানের সরকারি ভাষা হবে ? স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে কোন্ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে ? এইসব সমস্যার সমাধান কি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় করা যায় ? যায়না। ভাষা নিয়ে এই সমস্যা কেবল সাঁওতালদেরই নয়। নাগাল্যান্ডেও নাগা উপভাষা, অর্থাৎ 'ডাইলেক্ট'গুলোর মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। উপজাতিগুলোর ভেতরে আরো ছোট ছোট সম্প্রদায় থাকে। যেমন, নাগাদের নিজেদের মধ্যে আবার একাধিক সম্প্রদায় আছে যাদের নিজ নিজ সংস্কৃতি এবং ভাষা আছে। কিন্তু কোনও সাধারণ নাগা ভাষা সকলের নেই। ডিমাপুরের চলতি নাগা ভাষাকে বলে 'নাগামিজ', কিন্তু এই ভাষার কোনও লিপি নেই, কোনও সাহিত্য নেই। এইগুলো বিকশিত করার জন্য সরকারি তরফে কোনও চেষ্টা হচ্ছে কি ? আদৌ নয়। গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমর সিং চৌধুরী তো নিজে আদিবাসী। তাতে কি গুজরাটে আদিবাসীদের ওপর শ্রেণীশোষণ বন্ধ হয়েছে ? গুজরাটের আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য কী করা হয়েছে ? কিছুই নয়। এখন তো ঝাড়খন্ডে আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার হয়েছে। দেখা যাক্, ঝাড়খন্ডে সাঁওতালি, মুন্ডা, ওঁরাও, কুর্মী ভাষা এবং সাহিত্যের বিকাশের জন্য এই সরকার কী কাজ করে ? যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আমরা একদিন লড়েছিলাম, সেই ইংরেজ আমলে রোমান লিপির ভিত্তিতে মুন্ডা ভাষাকে সুদৃঢ় আকার দেওয়া হয়েছিল শুধু নয়, মুন্ডা ভাষার ব্যাকরণও তৈরি হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ আমলে যে কাজ করা হয়েছিল, আদিবাসী রাজ্য ঝাড়খন্ডে তাদের নিজেদের সরকার আজ তেমন কিছু করতে পারছে কি ?

এই হলো আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যাবলীর মধ্যে কয়েকটির রূপ। ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে সমস্ত আদিবাসীদেরই এই একই সমস্যা। আজ সাঁওতাল বিদ্রোহ (হুল) দিবস পালন করার সময়ে তাদের এই সমস্যাগুলো নিয়ে তো আপনারা অবশ্যই বিচার বিবেচনা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যে আদিবাসীরা শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত তাদের সম্পর্কেও আপনাদের চিন্তা করতে হবে। এদের মুক্তির ব্যবস্থা করবে কারা ? এদের পথ দেখাবে কারা ? বর্তমানে যে কোনও আন্দোলন — তা সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক কিংবা ভাষা নিয়ে হোক — খেটেখাওয়া জনসাধারণের সহায়তা ব্যতিরেকে এবং খেটেখাওয়া জনসাধারণের আন্দোলনের সঙ্গে একত্রিত হওয়া ব্যতিরেকে, শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনের জোরে, সফল হতে পারে কি ? তা পারা সম্ভব নয়। এই কারণে, যে সমস্ত আদিবাসীদের নিজেদের সাধারণ ভাষা-সাহিত্য নেই, সাধারণ লিপি নেই তাদের সকলকে নিজ নিজ সাধারণ ভাষা, সাধারণ সাহিত্য, এবং সাধারণ লিপিকে বিকশিত করতে হবে। আদিবাসীদের খেটেখাওয়া অংশের মানুষের নিজস্ব উপলব্ধি, অনুভূতি, বিচার আদানপ্রদানের জন্য ভাষার একান্ত প্রয়োজন, শিক্ষা অর্জন করার প্রয়োজন তো তাদেরই সব থেকে বেশি। কেননা, তারাই তো উদীয়মান শক্তি যারা শোষণ ও জুলুমের নাগপাশ থেকে নিজেদের তো মুক্ত করবেই — গোটা সমাজকেও মুক্তি দেবে। সেইজন্যই, খেটেখাওয়া আদিবাসীদের লড়াইকেসাহায্য না করে আপনারা যদি হুল দিবস পালনের কর্মসূচিকে শুধু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন, তো সেটা নেহাত একটা আনুষ্ঠানিকতার বেশি কিছু হবেনা। তাই, শ্রেণীদৃষ্টিকোণ থেকে এই দিবসের মূল্যায়ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। এই সংগ্রামের অন্তর্নিহিত শ্রেণীদ্বন্দ্ব আমাদের চোখ এড়াতে পারে না।

ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময়, তার আগে এবং পরে ভারতের বাইরে থেকেও মার্কসের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে একের পর এক এই যে লড়াইগুলো হয়ে চলেছে সেগুলোর মধ্যে জাতীয়তাবাদের উপাদান আছে। কমরেড শিবদাস ঘোষও এই কথাই বলেছেন। জমিদারবর্গ এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিলকা মাঝি, সিধু, কানু আর বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে আদিবাসী কৃষকদের আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপাদান সহ শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া আর কিছু ছিলনা।

জবলপুরে মহিলাদের রাস্তা অবরোধ

মধ্যপ্রদেশের জবলপুর শহরের মহিলারা এম এস এস ও মহিলা সংঘর্ষ সমিতির নেতৃত্বে নাগরিক পরিষেবার দাবি আদায় করলেন। ভাঙাচোরা রাস্তা, জঞ্জালের পাহাড়, পানীয় জলের অভাব, রাস্তায় বেওয়ারিশ গরু-মোষের অবাধ চলাফেরা ইত্যাদি নিয়ে মানুষের ক্ষোভ জানিয়ে ২৫ আগস্ট পুরসভার মেয়রকে দু'টি মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দিয়ে প্রতিকার চাওয়া হয়েছিল। ১৫ দিনের মধ্যেও কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় ১১ সেপ্টেম্বর প্রায় পাঁচশ মহিলা শহরের ব্যস্ততম রাস্তা কাঁচঘর চৌরাস্তায় অবরোধ করেন। দাবি না মানলে অবরোধ তোলা হবে না — এই দৃঢ় ঘোষণায় কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিরা অবরোধ স্থলে এসে দাবি পূরণের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেন এবং পরের দিনই পুরসভার পক্ষ থেকে কাজ শুরু করা হয়।

হুগলি জুট মিলে মালিকদের জারি করা সাসপেনশন অব ওয়ার্কের প্রতিবাদে শ্রমিকদের ধরনায় বক্তব্য রাখছেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সহসম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য

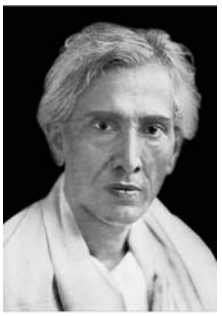

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে

"... ওদের সমাজনীতির যেমন interpretation-ই দেওয়া যাক তার আসল কথা হচ্ছে ধনী হওয়ার। ওদের সামাজিক ব্যবস্থা, ওদের সভ্যতা, ওদের ধনবিজ্ঞান—এর সঙ্গে যার সামান্য পরিচয়ও আছে, এ সত্য সে অস্বীকার করবে না। এ ধনী হওয়ার অর্থ ত কেবল সংগ্রহ করাই নয় ! সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেমনি ধনহীন করে তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য। নইলে, শুধু নিজে ধনী হওয়ার কোন মানেই থাকে না ! সুতরাং কোন একটা সমস্ত মহাদেশ যদি কেবল ধনী হতেই চায় ত অন্যান্য দেশগুলোকে সে ঠিক সেই পরিমাণে দরিদ্র না করেই পারে না। .... এই তার মেদ-মজ্জাগত সংস্কার, এই তার সমস্ত সভ্যতার ভিত্তি, এর 'পরেই তার বিরাট সৌধ অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে।

.... নিজের প্রয়োজনটুকুই কি একমাত্র সত্য ? যার নেই তার প্রয়োজন মিটানোর কি কোন মূল্যই পৃথিবীতে নেই ? সেইটুকু বাইরে চালান দিয়ে অর্থ সঞ্চ য় না করাই হ'ল অপচয়, হ'ল অপরাধ ? এই নির্মম, নিষ্ঠুর উক্তি .... মুখ দিয়ে বার হয়েছে তাদের যারা বিদেশ থেকে এসে দুর্বলের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার দেশব্যাপী জালে ফাঁসের পর ফাঁস যোজনা করে চলেচে।

"বিগত মহাযুদ্ধের দিনে পরস্পরের গলা কাটিয়া বেড়ানই যে মানুষের একমাত্র ধর্ম ও কর্তব্য, এই অসত্যকে সত্য বলিয়া যে দুই পক্ষের লোকই মানিয়া লইয়াছিল, সে ত কেবল অনেক কলম এবং অনেক গলার সমবেত চিৎকারের ফলেই। যে দুই-একজন প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিল, আসল কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের অবধি ছিল না।"

.... ওদের উদ্দাম বণিকবুদ্ধি'র তত্ত্বকথাটুকুকেই সার সত্য বলে বুঝে আছেন, কিন্তু আসলে এতবড় অসৎ বস্তু পৃথিবীতে আর নেই। ওরা জানে, শুধু ষোল আনার পরিবর্ত্তে চৌষট্টি পয়সা গুনে নিতে—ওরা বোঝে কেবল দেনা আর পাওনা — ওরা শিখেচে শুধু ভোগটাই জীবনের একমাত্র ধর্ম বলে স্বীকার করতে। তাই ত ওদের পৃথিবী-জোড়া সংগ্রহ ও সঞ্চ য়ের ব্যসন জগতের সমস্ত কল্যাণ আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। .... এই গুরুভারেই ত সংসারে কোথাও গরীবের নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা নেই।"

"দূর থেকে এসে যারা জন্মভূমি আমাদের অধিকার করেছে, আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্যাদা আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, —সমস্ত যে কেড়ে নিলে তারই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর রইল না আমার?

পশ্চিমের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র যতখানি বেড়ে উঠেছে গত যুদ্ধের সময়, এতখানি এইটুকু সময়ের মধ্যে বোধ করি আর কখনো হয়নি। মানুষ মারবার নব নব কৌশল এরা যত আবিস্কার করেছে ততই আনন্দে, দম্ভে এদের বুক ভরে উঠেছে। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আগুন দিয়ে, বিষ দিয়ে পুড়িয়ে গ্রামকে গ্রাম, শহরকে শহর ধ্বংস করবার কত ফন্দিই না এরা বার করেছে এবং আরও কত বা'র করত এই যুদ্ধ টা আরও কিছুদিন অগ্রসর হ'লে। সৌভাগ্য এবং সভ্যতার বোধ করি এদের এই একটিমাত্র মাপকাঠি কে কত অল্প পরিশ্রমে কত বেশী মানব হত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটাই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন।

.....দেখেছ তাদের বিশ্বগ্রাসী বিরাট ক্ষুধার পরিমাণ? এদেশের মালিক তারা, ...আজ ব্রিটিশ-সম্পদের তুলনা হয় না। কত জাহাজ, কত কল-কারখানা, কত কত সহস্র ইমারত। মানুষ মারবার উপকরণ আয়োজনের আর অন্ত নেই। .....জানো এই বিরাট ঐশ্বর্য্যের উৎস কোথায়? .....এই বাংলার দশ লক্ষ নর-নারী প্রতি বৎসরই শুধু ম্যালেরিয়া জ্বরে মরে। এক একটা যুদ্ধ জাহাজের দাম জানো? এর একটার খরচে কেবল দশ লক্ষ মায়ের চোখের জল চিরদিনের তরে মোছানো যায়।.....শিল্প গেলো, বাণিজ্য গেলো, ...নদীর মুখ বুজে মরুভূমি হয়ে উঠছে, চাষা পেট পুরে খেতে পায় না, শিল্পী বিদেশের দুয়ারে মজুরী করে, —দেশে জল নাই, অন্ন নেই, গৃহস্থের সর্বোত্তম সম্পদ যে গোধন নেই, —দুধের অভাবে শিশুদের শুকিয়ে মরতে দেখেছো?

... এখন রাজা নেই, আছে রাজশক্তি। এবং সেই শক্তি আছে জনকয়েক বড় ব্যবসাদারের হাতে। হয় স্বহস্তে করেন, না হয় লোক দিয়ে করান। বণিকবৃত্তিই এখন মুখ্যত রাজনীতি। শোষণের জন্যই শাসন। নইলে তার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। দশ পনের বছর পূর্বে যে জগৎ-ব্যাপী সংগ্রাম হয়ে গেল, তার গোড়াতেও ছিল ঐ এক কথা—ঐ বাজার ও খদ্দের নিয়ে দোকানদারের কাড়াকাড়ি। "

(শিক্ষার বিরোধ, বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, পথের দাবী, তরুণের বিদ্রোহ থেকে সংকলিত)

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৬ বর্ষ / ৮ সংখ্যা ৮

‘বিদ্যুৎ আইন ২০০৩’

ছয়ের পাতার পর

ঠিক করা হবে।’ আরও বলা হয়েছে — প্রতিটি রাজ্য সরকার নিজ নিজ রাজ্যের রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন করবে। (কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইন, ’০৩ এর ৮২(১) ধারা) এবং এই কমিশনই রাজ্যে বিদ্যুতের মাশুল নির্ধারণ করবে [C/86(1) কেন্দ্রীয় আইন।]

এই কমিশন যাতে রাজ্য সরকারের নির্দেশ মত পরিচালিত হয় এজন্য কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ এর ১০৮নং ধারায় বলা হয়েছে — ‘‘Direction by the State Government, (1) In the discharge of its function, the State Commission shall be guided by such directions in matters of policy involving public interest as the state government may give to it in writing.

(2) If any question arises as to whether any such direction relates to a matter of policy involving public interest, the decision of the state government thereon shall be final’’.

অর্থাৎ নতুন বিদ্যুৎ আইন অনুযায়ী জনস্বার্থের বিষয়ে রাজ্য সরকারের নির্দেশই হবে শেষ কথা। ইচ্ছা করলে কমিশনের জনস্বার্থ সম্পর্কিত যে কোন সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার বাতিল করে দিতে পারে। ফলে রাজ্য সরকারের আর কোন ক্ষমতাই নেই বলে সি পি এম যে প্রচার তোলার চেষ্টা করছে তার সাথে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই।

তাহলে সি পি এম এটা করছে কেন? আসলে তারা ভাল করেই জানে, তাদের ও বিজেপি সরকারের যৌথ উদ্যোগে যে ভয়ানক বিদ্যুৎ আইন রচনা করা হয়েছে, তার ফলে সাধারণ গ্রাহকদের পক্ষে বিদ্যুৎ ব্যবহার করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। ফলে ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র কৃষক, সাধারণ গৃহস্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে মারাত্মকভাবে। বড় বড় শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে তারা একাজ করছে। আবার এর ফলে জনমনে যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে তার কোপ যাতে সি পি এমের গায়ে এসে না লাগে, তাকে যাতে কমিশনের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, এজন্যই সি পি এম জোর কদমে নয়া বিদ্যুৎ আইনের বিরুদ্ধে লোকদেখানো জেহাদ ঘোষণা করেছে।

সকলেই আমরা জানি, এই বিদ্যুৎ আইন, ’০৩ বিল আকারে লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল ২০০১ সালে। বিলকে আইনে পরিণত করার জন্য যে পার্লামেন্টারি কমিটি গঠিত হয়েছিল তার চেয়ারম্যান ছিলেন কংগ্রেস নেতা সন্তোষমোহন দেব, আর সদস্য ছিলেন সি পি এম সাংসদ বাসুদেব আচার্য। সেই কমিটিতে বিকল্প প্রস্তাব পেশ করারও সুযোগ ছিল। অথচ সি পি এম সেসব কিছুই করেনি। জনমত সংগঠিত করে গত ২-৩ বছরে এই বিলের বিরুদ্ধে লাগাতার গণসংগ্রাম গড়ে তোলার সুযোগ ছিল, সংসদের মধ্যে ঝড় তোলা যেত, বিধানসভায় বিকল্প প্রস্তাব পাশ করিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো যেত — এ ধরনের অসংখ্য কর্মসূচির কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু সি পি এম নেতারা এসব কিছুই করেন নি। অর্থাৎ বিলটাকে কার্যকরীভাবে আটকে দেওয়ার মতো কোন আন্দোলনের কর্মসূচি সি পি এম নেয়নি। শান্তিপূর্ণভাবে বিলটি আইনে পরিণত হতে তারা দিয়েছে এবং তারপর লোকদেখানো কিছু হৈ চৈ করে মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এত সহজে কি তা সম্ভব হবে? না, তা সম্ভব নয়। এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে আজ জনগণ যেভাবে জেগে উঠছে, অ্যাবেকার পতাকাতলে গ্রাহকদের প্রতিবাদ যেভাবে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, তাতে মানুষকে মিথ্যা দিয়ে বিভ্রান্ত করা আজ আর আগের মত সহজ নেই।

প্রবীণ পার্টি সদস্যের জীবনাবসান

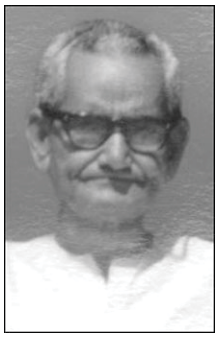

ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বর্ষীয়ান এস ইউ সি আই নেতা কমরেড অমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৭ আগস্ট ২০০৩ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

পঞ্চাশের দশকে এযুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের সহযোদ্ধা কমরেড হীরেন সরকার পার্টি সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে সিংভূম জেলার ঘাটশিলায় আসার অল্পকালের মধ্যেই ১৯৫২ সালে তিনি কমরেড হীরেন সরকারের সান্নিধ্যে আসেন এবং ১৯৫৩ সালে পার্টির সদস্য হন। তিনি ধলভূমগড়-নরসিংগড়কে কেন্দ্র করে সংগঠন গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর উদ্যোগেই ১৯৫৬ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের পরিচালনায় সেখানে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। তিনি এই অঞ্চলের দীনদুঃখী, আদিবাসী মুণ্ডা প্রমুখ সর্বহারা শোষিত নির্যাতিত মানুষের মুখে প্রতিবাদের ভাষা দিয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালে এলাকায় বহু ছোট বড় এবং দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। সমস্ত কমরেডদের তিনি সর্বপ্রকারে সাহায্য করে পার্টি সংগঠন বাঁচিয়ে রাখার এবং তাকে মজবুত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি অমিত সাহস এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। জীবনে কখনো কোনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। যেকোন অবস্থায় কোনও অন্যায় অবিচার দেখলে তিনি তার প্রতিবাদ করতেন। জীবনের বহু উত্থান-পতন, ঝড়-ঝঞ্ঝা তাঁকে পার্টির বিচারধারা ও পার্টির রাস্তা থেকে বিচলিত করতে পারেনি। অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত তিনি পার্টির সদস্য থেকেছেন। শেষের দিকে শারীরিক অসুস্থতার জন্য বাইরে যেতে না পারলেও বাড়িতে থেকেই তিনি পার্টির চর্চা করে গেছেন। কমরেডরা নিয়মিত তাঁর বাড়িতে আসতেন। তিনি নানাভাবে পরামর্শ ও সাহচর্য দিয়ে সংগঠন বিকাশের চেষ্টা করে গেছেন। তিনি বাড়ির সদস্যদের মধ্যেও পার্টির চিন্তাধারা নিয়ে গেছেন। পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যেই পার্টি এবং পার্টির নেতা ও কমরেডদের প্রতি শ্রদ্ধার মন তৈরি করে গেছেন।

মৃত্যুর পরেই তাঁর মরদেহ পার্টির রক্তপতাকায় আবৃত করা হয়। তাঁর মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় সর্বাগ্রে পার্টির ঝাণ্ডা নিয়ে কমরেডরা এগিয়ে চলেন। “জি এস সঙ্গীত” ও ইন্টারন্যাশানাল গাইতে গাইতে গ্রামের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পার্টি অফিসে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পার্টির সমস্ত ফ্রন্টের প্রতিনিধিরা মাল্যদান ও লাল সেলাম জানিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে জাতি, ধর্ম, পার্টি নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ সজল চোখে তাঁকে শেষ দর্শন করেন ও শ্রদ্ধা জানান।

তাঁর স্মরণে ১ সেপ্টেম্বর নরসিংগড় বাজারে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতে পূর্ব সিংভূম জেলার সম্পাদক কমরেড রঞ্জিত মোদক, কমরেড দুর্গা দাশ, কমরেড সীতারাম টুডু ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাগণ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং এই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের বহু মানুষ উপস্থিত থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কমরেড অমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লাল সেলাম

বন্যা ঃ সরকারি অবহেলা

একের পাতার পর

কোটি টাকা চেয়েছে। কিন্তু এই টাকা যদি পাওয়া যায়ও, তাতেও কীভাবে এই টাকা ব্যয় করা হবে। সে সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কোনও পরিকল্পনা নেই। যদি সামান্যতম সদিচ্ছা ও পরিকল্পনা থাকত, তাহলে ভাঙন রোধ করার নামে প্রতি বছর ঠিক বর্ষার মরশুমে নদীতে বৃথা বোল্ডার ফেলার পিছনে কোটি কোটি টাকার চরম দুর্নীতি চলতে পারত না। শুধু কি তাই? ক্যাগ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, এবছর রাজ্য সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে — ২০০২-০৩ সালে যার পরিমাণ ছিল ১৯০.৪৭ কোটি টাকা, ২০০৩-০৪ সালে তা করা হয়েছে ৮৪.৯৮ কোটি টাকা। বস্তুত এ ধরনের বিপর্যয়ে বরাবরই রাজ্য সরকার নিজের দায় দায়িত্ব পালন না করে কেন্দ্রের উপর দায় চাপিয়ে দিতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

তিনি দাবি জানান, যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে ত্রাণের কাজ করতে হবে; নদী বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্যদের নিয়ে কমিটি করে সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সর্বদলীয়ভাবে দাবি জানাবার জন্য আমরা সাহায্য করতে প্রস্তুত। এ রাজ্যেও সমস্ত বিষয় নিয়ে পর্যালোচনার জন্য সরকারকে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকতে হবে।

ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সরকারি অবহেলার প্রতিবাদে দুই জেলাতেই আন্দোলনের যে কর্মসূচিগুলি চলছে তাও তিনি সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেন, আমরা ২২ সেপ্টেম্বর মালদায় আইন অমান্য করবো, ২৪ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদে শিশুমৃত্যুর প্রতিবাদে শিশু ও কিশোরদের বিক্ষোভ মিছিল হবে। ২৬ সেপ্টেম্বর বহরমপুরে আইন অমান্য হবে। ২৫ সেপ্টেম্বর আমরা রাজ্যব্যাপী রিলিফ সংগ্রহ করবো। তিনি আরো বলেন, পূজা কমিটিগুলিকে ব্যয়সঙ্কোচ করে দুর্গতদের সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

আদবানিকে রেহাই

একের পাতার পর

সকলেরই নাম ছিল আদবানির পরে। সেদিন সি বি আই’র চার্জশিটে ১৯৯০ সালে সোমনাথ থেকে আদবানির রথযাত্রা থেকে শুরু করে মসজিদ ধ্বংসের সময় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহকে নির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত ঘটনা বর্ণনা করে মূলত চারটি নির্দিষ্ট অভিযোগ করা হয়েছিল। এর ভিত্তিতেই লক্ষ্ণৌ আদালত এদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের জন্য সি বি আইকে নির্দেশ দিয়েছিল। ১৯৯৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি যখন প্রথম চার্জশিট পেশ করা হয় তখন আদবানি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন না, ১৯৯৭-এ লক্ষ্ণৌ আদালত যখন সি বি আইকে উপরোক্ত নির্দেশ দেয়, তখনও আদবানি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন না।

এরপর যখন বিজেপি ক্ষমতায় এল, তারপরই একদিকে মামলা বানচাল করার নানা প্রয়াস চালানো হল, অন্যদিকে সি বি আই ধীরে ধীরে অভিযোগ লঘু করতে শুরু করল। নানা পথ ঘুরে অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট গত বছর ২৯ নভেম্বর মামলাটি রায়বেরিলির বিশেষ আদালতে পাঠায়। তারপর গত ৩১ মে সি বি আই যখন অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করল, ততদিনে আদবানির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অর্থাৎ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০(খ) ধারা সি বি আই মুছে দিয়েছে। ১৯৯৭ সালে আদবানির বিরুদ্ধে চার্জশিটে তার ও অন্যান্যদের ভাষণ থেকে বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করা ছিল। এবার সি বি আই তা দেয়নি। এছাড়াও অভিযোগ উঠেছে, বেশ কিছু তথ্যচিত্র ও স্থিরচিত্রে আদবানির উত্তেজক বক্তৃতা ধরা আছে। সি বি আই সেগুলিও পেশ করেনি।

অনেকে মনে করেন, সি বি আই একটি ‘নিরপেক্ষ’ তদন্ত সংস্থা। এই ধারণা যে ভুল, তা ইতিপূর্বেই কংগ্রেস শাসনেও প্রমাণ হয়েছে। বফর্স মামলাকে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠাতে কীভাবে সি বি আই-এর তদন্তকে প্রভাবিত করা হয়েছে তা অজানা নয়। এবং একথাও পরিষ্কার যে, বফর্স মামলার তদন্ত শেষ হয়ে কোনদিন সত্য উদঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। মুরলি মনোহর যোশী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে যে চার্জশিট এখন দাখিল করা হল, সেই মামলার দ্রুত পরিণতি ঘটবে — এই আশাও অলীক। তবে সি বি আই এবার যেমন নগ্নভাবে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মত জঘন্য ষড়যন্ত্রের অভিযোগ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদবানিকে দায়মুক্ত করে দিল, তা দেখিয়ে দিল, উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের মুখে ‘সুশাসন’ ‘আইনের শাসন’ ইত্যাদি ভাষণ কতবড় ভণ্ডামি! খুনী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপি নেতাদের মধ্যে বিশেষভাবে কেন আদবানির প্রত্যক্ষ শিষ্যত্ব নিয়েছেন, এই ঘটনা তা অনেকটা পরিষ্কার করে দিল।

ইরাক ও প্যালেস্টাইনে সাম্রাজ্যবাদী দখলদারির প্রতিবাদে
অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের ডাকে

অবস্থান বিক্ষোভ

২৬শে সেপ্টেম্বর, বিকাল ৩টা, এসপ্লানেড, মেট্রো রেলস্টেশন

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net